The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 177-192, ISSN 2306-3920

সমরেশ বসুর *টানা-পোড়েন* : অন্ত্যজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিত

রেজওয়ানা আবেদীন*

[**সার-সংক্ষেপ :** অন্ত্যজ জীবনকে কেন্দ্রে রেখে সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাস *টানা-পোড়েন* (১৯৮০)। বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত তাঁতিদের শিল্প বনাম পেশাকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম *টানা-পোড়েন*। অজস্র মানুষ ও তাদের জীবনকথা নিয়ে সৃষ্টি হয়নি উপন্যাসটি, বরং তাঁত-শিল্পীদের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন মানুষের অন্তর ও বহির্জগতের নিখুঁত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র পাটরাঙাদের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাঁচু কীতের জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মাধ্যমে সমগ্র বালুচরী তাঁতি সমাজের দারিদ্র্য-শোষণ-রাজনীতি নির্ভর শিল্পের দুর্দশা প্রকাশিত হয়েছে এখানে। শিল্প, পেশা ও জীবনের টানাপড়েন বিবেচনায় অন্ত্যজ জীবনের দর্পণে *টানা-পোড়েন*কে বিবেচনা করা হয়েছে।]

অন্ত্যজ : কারা, কেন, কীভাবে ?

সমাজের খেটে খাওয়া শোষিত মানুষ ইতিহাসের নানা পর্যায়ে গবেষকদের জবানিতে নানা নামে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে তাদের জীবন যাপনে বা সামাজিক অবস্থানের তেমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হতে দেখা যায়নি। বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে ছিল হিন্দুধর্মে বর্ণভেদে[১] 'অন্ত্যজ' বা অস্পৃশ্য পর্যায়ের সেই জাতভেদ প্রথাই সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তীকালে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিতে হয়েছে 'নিম্নবর্গ' বা 'নিম্নবর্ণ'। আবার কোথাও বা হয়েছে 'ব্রাত্যশ্রেণি'। এই শিল্পায়নের যুগে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে সমাজ-জীবনেও

---

* **ড. রেজওয়ানা আবেদীন :** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১. বাংলা চলিত 'জাত' অর্থে 'বর্ণ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দ 'caste' অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত। ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী 'caste' বলতে, 'as ystem of deviding Hindu society into classes: the cast system'(*Cambridge AdvancedLearner'sDictionary*, Edited by Colin Mcintosh, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Fourth Edition, p. 228)

নানা রূপরেখা সূচিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কল-কারখানার প্রসারে একদিকে যেমন কৃষিভূমি হ্রাস পেয়েছে অপরদিকে শ্রমিক-শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় একটি কালো অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছে। কৃষি-প্রযুক্তিতে একদিকে যেমন আধুনিকীকরণ হয়েছে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া 'কৃষিজীবী' মানুষগুলো খেত-মজুর থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে বা হতে বাধ্য হয়েছে।

অন্ত্যজদের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক 'ব্রাত্য' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৭৫)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ভাষাতেও :

> ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত
> দেবালয়ের মন্দির দ্বারে
> পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
> *পত্রপুট*, পনেরো নং কবিতা।
> (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫২ বঙ্গাব্দ : ৪২)

তারপরেও ব্রাহ্মণরা উচ্চ তিন বর্ণের (এর মধ্যে নিজেদের শ্রেণিভুক্ত কিছু ব্রাহ্মণও ছিল) অনেককেই অন্ত্যজদের দলে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের বলা হয়েছে পতিত। তারা বর্ণচ্যুত। 'পতিত' শব্দের অর্থ হল ভ্রষ্ট ও স্বধর্মচ্যুত। শূদ্ররা পতিতরূপেই চিহ্নিত ছিল। তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল শুধু উচ্চবর্ণের সেবা।[২] অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও পতিত হয়ে যায় ধর্মচ্যুত হয়ে। প্রাচীন ভারতে 'ধর্ম' অর্থে সবসময় কৌলিক বৃত্তিকেই বোঝান হয়েছে। আমরা বর্তমানে যে অর্থে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করি তার সঙ্গে কোনো অর্থেই ভারতীয় বেদ-পুরাণ-মহাকাব্যে ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দটির সাযুজ্য নেই। বৈদিক যুগেই প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন বর্ণের সন্তানদের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে তাদের মিলনকে কখনো বন্ধ রাখা যায়নি। বলতে গেলে তা অপ্রতিরোধ্যই ছিল। তাছাড়া শূদ্ররা তো অনেকটা বাধ্যই ছিলউচ্চবর্ণের সবরকম 'সেবাব্রতে'। তাদের সঙ্গে মিলনকেও তাই ঠেকানো যায়নি। ফলে নানা বর্ণের মিশ্রণ যখন ঘটতে থাকল, জাতি হিসেবে তারাও হয়ে গেল ব্রাত্য। এইভাবে ব্রাত্য সমাজের দলই ভারী হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৮০)

---

২. একমেব তু শূদ্রস্য প্রভু কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণনাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥৯১॥
অনুবাদঃ প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্ধারণ করে দিয়েছেন,– তা হ'ল কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা
না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা ॥৯১॥
[মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদনা ও অনুবাদ),*মনুসংহিতা*,পূর্বোক্ত, পৃ.১৫]

বর্ণব্যবস্থার নামে হিন্দুধর্মে যে জাতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, যা ছিল মূলত শ্রমবিভাজনেরই নামান্তর। ধর্মপ্রচারক বা সমাজসংস্কারক যাই বলা হোক না কেনো, প্রথম বিদ্রোহী পুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩)। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ১৬)। তাঁর ভাষ্যেই পাই :

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-
দগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো
ন বেদাঢ্যোহপি নাস্তিকঃ ॥

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ বেদ জানে অথচ নাস্তিক- সে পূজার পাত্র নয়। যে চণ্ডাল হয়েও সদাচারী, প্রবল ভক্তির উজ্জ্বল অগ্নিতে যার জাতের পাপ পুড়ে গেছে, সে বিদ্বান লোকের কাছেও পূজ্য ॥ ৬ ॥ (মনু ১৪১৮ বঙ্গাব্দ : ৩৪১)

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) *হরিজন* নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি শূদ্রদের নামকরণ করেছিলেন 'হরি'। শ্রীকৃষ্ণের সমমর্যাদায় শূদ্রদের স্থান দিয়ে তিনি, তাদের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকায় তিনি শূদ্রদের অধিকার আন্দোলনের পক্ষে লেখালেখি করেছেন। শূদ্রদের একটি অংশের নামের আগে নমঃ যোগ করে তাদের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৪৬)

জাতের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ভারতীয় সমাজের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংবিধানের জনক ড. বি.আর.অম্বেডকর (১৮৯১-১৯৫৬) ছিলেন একজন দলিত শ্রেণির মানুষ এবং নিজ জাতির মানুষের জন্য কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর মতে, হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যে চারটি বর্ণ বা শ্রেণি ছিল, পরবর্তীকালে সেসব শ্রেণিইএক একটি অবরুদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। যেখানে কেবল জন্মসূত্রেই প্রবেশাধিকার মেলে। এভাবেই জাতিভেদ প্রথার জন্ম হয়। জাতিভেদ প্রথা ভগবানের সৃষ্টি অথবা তা ভারতীয় সমাজের বিশেষ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল – সাধারণ্যে প্রচলিত এই ধারণাগুলো তিনি খারিজ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতিভেদ প্রথার বিকাশ বুঝতে গেলে, বিষয়টিকে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করেছিল, রাজা বা ক্ষত্রিয়রা তা কার্যকর করত। এইভাবে ধর্মগ্রন্থে বিশেষ জাতির জন্য নির্ধারিত কর্তব্যগুলো পালন করার অর্থ কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, রাজার আদেশের প্রতি আনুগত্যও তাতে প্রকাশিত হতো। অন্যভাবে বলতে গেলে ধর্ম ও রাষ্ট্র একত্র হয়ে নিম্নশ্রেণি অর্থাৎ শূদ্রদের প্রথমে মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বে বন্দি করল, পরে তারা অস্পৃশ্যতার নাগপাশে বাঁধা পরল। (অর্জুন ডাঙলে ২০০১১ : ৩৬, ৩৭)। বঞ্চনা, শোষণ বা সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের

ভিত্তিতে গঠিত নিম্নবর্গের সঙ্গে দলিত শ্রেণির মানুষের একাংশকে মেলান হয়েছে অনেক প্রসঙ্গে। ফলে 'নিম্নবর্ণ', 'নিম্নবর্গ' ও কখনো কখনো 'দলিত' সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নানা প্রসঙ্গে।

'অন্ত্যজ' বলতে সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত মূলত দরিদ্র 'সবার পিছে সবার নীচে' সর্বহারাদেরই বোঝান হয়েছে। তবুও 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও পরবর্তী সময়ে তার সংকীর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জনা স্মরণ করা প্রয়োজন। আক্ষরিকভাবে অন্ত্য=অন্ত+জ, জন্মা (যে জন্মে) = অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট-পুরুষের (ঋগ্বেদ) দেহ থেকে জন্মের পর শেষজাত-চতুর্থ বর্ণ শূদ্রই হল অন্ত্যজ। এই অর্থে 'শূদ্র' অর্থে কিন্তু কোনো ঘৃণার কথা নেই-কারণ পবিত্র বিরাট-পুরুষের সকল অঙ্গই তো পবিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জ (জাত) অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগল অন্ত্যজ। তখন থেকে 'অন্ত্যজ' শব্দের প্রতি সমাজের অন্য তিনবর্ণের অবজ্ঞা লক্ষ করা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে বিধান দেওয়া হল যে, শাস্ত্রসম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনের ফলে সংস্রবের সন্তানরাই অন্ত্যজ। আবার 'অন্ত্য' অর্থ 'নীচ', তাই নীচকুলে যার জন্ম সেই নীচাশয়, অধম ব্যক্তিই অন্ত্যজ। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১৯৭৩ : ৭৪)

ব্রাত্য শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্যে অনেক বিবর্তন হয়েছে। ব্রাত্য সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ এখন বহুদূরে বিস্তৃত। সমাজতত্ত্ববিদ, কবি, সাহিত্যিকদের কাছে 'ব্রাত্য' শব্দটির নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাদের ভাষ্যে সকল শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষই ব্রাত্য। সমাজের তথাকথিত মুচি, হাড়ি, ডোম, মেথর, বাউরি, বাগদি, জেলে, কাহার, এরাই শুধু ব্রাত্য নয়। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, গোয়ালা, সুতার, বণিক, নমঃশূদ্ররাও ব্রাত্য। এই 'ব্রাত্য' মানুষগুলোই কখনো হয়েছে 'নিম্নবর্গ' কখনো বা 'অন্ত্যজ'। আমরা অন্ত্যজদের পেয়েছি সর্বহারা ভিখারী, যত আশ্রয়হীন মানুষ, বস্তিবাসী, কুলি, মুটে, মজুর প্রভৃতি পেশাজীবীদের মধ্যে। তাদের আলাদা করে শূদ্র বলে চিনতে হয় না। জাত-পাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এরা 'অন্ত্যজ'। আজকের পৃথিবীতে তারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বেড়াজালে অন্ত্যজ নয়। এদেশে সমাজে Open Class System[৩] প্রচলিত হওয়ার পর নিম্নবর্গের মানুষ বর্ণগত অভিশাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বা বিবাহ সূত্রে উচ্চবর্ণের সমাজে উঠে আসতে

---

৩. An open class system is the stratification that facilitates social mobility, with individual achievement andpersonal merit determining social rank. The ierarchical social status of a person is achieved through their effort. Any status that is based on family background, ethnicity, gender, and religion, which is also known asascribed status, becomes less important. There is no distinct line between the classes and there would be more positions within that status. Core industrial nations seem to have more of an ideal open class system. Category : Sociological terminology, *Wikipedia*, the free encyclopedia, date: 2/11/16

পারে। আবার বিপরীত চিত্রও দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে উচ্চবর্গের মানুষ 'অন্ত্যজ'জনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর দেশভাগের ফলে, যে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাতে সেই ছিন্নমূল মানুষগুলোর একাংশকে আজ 'অন্ত্যজ' বলে চিহ্নিত করা হলে বোধ করি ভুল হয় না।

সমরেশ বসু ও *টানা-পোড়েন* (১৯৮০)

সমরেশ বসুর উপন্যাসের সংখ্যা শতাধিক। এই বিশাল উপন্যাস ভাণ্ডারের মাঝে বৈচিত্র্যের কোনো কমতি নেই। ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ, রাজা-রাজড়া, অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য নানা ধরনের মানব চরিত্রের সমাবেশ যেমন দেখা যায় তাঁর কাহিনিতে তেমনি চিত্রায়ণ পদ্ধতিতেও নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাক্ষ্য যথেষ্ট পরিমাণেই দৃষ্টিগোচর হয়। সমরেশের সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে শ্রমিক ও নিম্ন-পেশাজীবী মানুষের সান্নিধ্যে থাকার কারণেই (স্বপণ দাসাধীকারী ১৯৯৯ : ৫১৯), প্রথম দিকের উপন্যাসগুলোতে অন্ত্যজ মানবগোষ্ঠীর চিত্রায়ণ দেখা যায় *নয়নপুরের মাটি* (১৯৫২), *উত্তরঙ্গ* (১৯৫১), *জগদ্দল* (১৯৬৬), *বি.টি.রোডের ধারে* (১৯৫৩), *গঙ্গা* (১৯৫৭), *ছিন্নবাধা* (১৯৬২), *রানীর বাজার* (১৯৭৩) প্রভৃতি উপন্যাসে। পরবর্তীকালে আশির দশকে রচিত হতে দেখা যায় অন্ত্যজ গোষ্ঠীজীবনকে ঘিরে *টানা-পোড়েন* (১৯৮০) ও *বাথান* (১৯৮৫) উপন্যাসদুটি।

সত্তরের দশকজুড়ে সমরেশ বসুর লেখক জীবনে দেখা যায় অনেকটাই আকাল। উল্লেখযোগ্য দুটি মাত্র লেখা, *মহাকালের রথের ঘোড়া* আর কালকূট নামে *শাম্ব*। এই দশকের শুরু থেকেই লেখক অভিজ্ঞতার এক নতুন ভূমি আয়ত্ত করতে চাইছিলেন। তাই হয়ত বার বার বিষ্ণুপুরে যাতায়াত করতে দেখা যায় তাঁকে। (সত্যজিত চৌধুরী ২০১৩ : ৯৭)। কলকাতার উপকণ্ঠ হয়ে গঙ্গার পূর্বদিক থেকে উত্তরের সম্পূর্ণ এলাকা সমরেশের আকৈশোর চেনা। সেই সঙ্গে গঙ্গার আশপাশের জীবনযাত্রার ধরনও লেখকের চিরচেনা। কিন্তু *টানা-পোড়েনে* সমরেশ একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন বাস্তবতার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বিষ্ণুপরের তাঁতিরা বালুচরি শাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য নতুন করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। কয়েক ঘর তাঁতি এই শিল্পে তাদের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সময় স্বাধীনতা পরবর্তী সদ্য অতীত। দেশজ শিল্পঐতিহ্য বাঁচিয়ে তোলার গরজ স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রেই পরিপুষ্টি সাধন করেছিল। বালুচরি শাড়ি উৎপাদনেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, কিন্তু তার সামান্যই ভোগ করার সৌভাগ্য হতো তাঁতির। মাঝ পথের ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রায় পুরোটাই আত্মসাৎ করত। ফলে, 'যাঁরা সারা বিশ্বের বিস্ময়, অতুলনীয় শিল্প সৃষ্টি করেছেন রেশমি সুতো বুনে বুনে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে বস্ত্র নেই, ঘরে অন্নের হাহাকার, মাথা গোঁজবার মতো একটি অটুট ঘরের অভাব [...]।' (সমরেশ বসু ২০০৩ : ৬৪০)। চাষির জীবন যেমন, যেমন গঙ্গার মাছমারাদের ভাগ্য

লিখন, তেমনি এই কারুশিল্পীরাও মহাজনের হাতের নাটাই। হরণ-পূরণের একই খেলা দেখা যায় ভারতবর্ষ জুড়ে, তারই একটি স্থানীয় রূপ বিষ্ণুপুরের তাঁতিজীবন।

দুর্গত এই অন্ত্যজ মানুষগুলোই কী অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন নিজেদের বংশগত বৃত্তিতে। *টানা-পোড়েনে* লেখক আকৃষ্ট হয়েছেন এঁদের শিল্প-নৈপুণ্যের দিকেই বেশি। বালুচরি শাড়ি কোন বাজারে বিকোয়, কোন বড় ঘরের ঘরণীর অঙ্গে ওঠে তার খবর রাখে না তাঁতি। ধার-কর্জ মিটিয়ে দেনা-পাওনার মাঝে সমতা আনার প্রচেষ্টাতেই তাদের দিন কাটে। বাঁচার গ্লানি নিয়ে বয়ে চলা এই মানুষদেরই আর এক রূপ দেখা যায় তাঁদের কাজের জগতে। অতন্দ্র শিল্পের ধ্যান, রূপ সৃষ্টির নিপুণতা এবং অটুট শৃঙ্খলাময় আয়োজন দরকার হয় এই কাজে। কারুকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে এ তাঁতিশিল্পীদের জীবন-যাপনেও রয়েছে এক বিশিষ্ট ধরন। ফলে অন্যান্য পেশাজীবী বা গোষ্ঠীর জীবন থেকে তা আলাদা। তাঁতশিল্পীদের এই বিশিষ্ট রূপটির ছায়া পড়ে তাই তাদের ঘর-দুয়ারের বিন্যাসে, গৃহস্থালির সঙ্গে ওতপ্রোত উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নিপুণতায়, ভাষা ব্যবহারে বা উপমা-রূপক-প্রবচনের বিশিষ্ট প্রয়োগে।

পঞ্চানন কীতের মতো তাঁতশিল্পীদের জীবনাচরণ তথা দৈন্য বোঝার জন্যে সমরেশ বসুকে অখণ্ড অভিনিবেশ রাখতে হয়েছিল। তাদের সমাজকাঠামো তথা অন্ত্যজ জীবনের টানাপড়েন বুঝে ওঠার জন্যে তিনি বার বার বিষ্ণুপুরে যাওয়া-আসা করছিলেন। টুকরো টুকরো আলাপনে নতুন এই অভিজ্ঞতা শোনাতেন বন্ধুদের। ওখানকার ভাষার চাল ও স্বরভঙ্গি রপ্ত করার চেষ্টা করছিলেন। বিশেষ করে এই তাঁতশিল্পীদের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে একদিকে তাদের শিল্পরুচি ও জীবনের সাধ-আহ্লাদ পূরণ করার টানাপড়েনে সমকালীন সমাজিক-অর্থনৈতিক প্রবণতার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। বিষয়গুলো মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে, আসন্ন শারদীয় রচনার দায় মেটানোর জন্য ১৯৭৬-এ লেখায় হাত দিয়েই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরের উপর এক বড় রকমের আঘাত পেলেন, যার জের বয়ে বেড়াতে হয়েছে আমৃত্যু। (সত্যজিত চৌধুরী ২০১৩ : ৯৮)। আঘাত পাওয়ায় লেখা বন্ধ হয়েছিল। ফলে লেখার জন্য হয়ত মন্দের চাইতে ভালই হলো বেশি। অনেকটা সময় নিয়ে ভাবার সময় পেলেন। নতুন পরিকল্পনা করে সে অনুযায়ী অস্পষ্ট জায়গাগুলো শুধরে নিতে পারলেন। ফলে অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে যে লেখাটি দাঁড় করানোর কথা ছিল, সেটাই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফসল হয়ে উঠল। এতটা সময় নিয়ে সমরেশ বসু আর কোনো বিষয়ে লেখেননি। ফলে বালুচরি শাড়ির কারুশিল্পীদের কাহিনি হয়ে উঠল তাঁর সফল রচনাগুলোর একটি। *টানা-পোড়েন* নামে উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৮ সালের শারদীয় *দেশ* পত্রিকায় ও গ্রন্থাবদ্ধ হয় ১৯৮০ সালে। *গঙ্গা* উপন্যাসের প্রায় দুই দশক পর লেখা হয় উপন্যাসটি। এর আগে অন্ত্যজ জীবনসংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলো (*উত্তরঙ্গ*, *নয়নপুরের মাটি*, *বি. টি. রোডের ধারে*, *শ্রীমতী কাফে*, *গঙ্গা*, *বাঘিনী* ইত্যাদি) প্রায় সবই পঞ্চাশ দশকের রচনা। তারপর আবার যেন সেই পূর্বসুর ধ্বনিত হয়ে উঠল

আশির দশকে এসে *টানা-পোড়েন* এবং *বাথান* উপন্যাসদুটিতে। লেখকের কুশলী-কলমে ফুটে উঠেছে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের জীবন ও শিল্পের অপরূপ নকশা নিয়ে *টানা-পোড়েন* উপন্যাস।

টানা-পোড়েনের সময়কাল স্বাধীনতা-পরবর্তী বিধান রায়ের আমল। এই সময়ের পঞ্চানন কীত, তাঁতির সেরা তাঁতি বিষ্ণুপুরের গর্ব পাঁচুকে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনির বিস্তার। পাঁচু কীতের বাবা জগৎবুড়ো, যার স্মৃতিতে কেবলই ভাঙনের অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে তাঁত ছেড়ে তাঁতি হয়ে উঠেছে চাষি, কেউ বা মুদির কারবারি। তাঁতের কাজের বাঁধা মজুরিতে সংসার চালনো কষ্টকর। কাজও জোটে না তেমন, তাই জাতব্যবসা ছেড়ে যায় আত্মীয়স্বজন। এই খেটে খাওয়া অন্ত্যজ মানুষগুলোর সব জীবিকাই অবশ্য কম-বেশি সমান, কারোই 'সংসারের জমিন মোটে খাপি না।' (সমরেশ বসু ২০০৩ : ৫৭৮)। বুড় জগতের রক্তে তবু তাঁতের মাকু চালাচালির শব্দ নেশা ধরায়। তাই বড় ছেলে গজানন ও ছোট ছেলে পঞ্চানন এখনো তাঁত ধরে রয়েছে বলে তার বড় গর্ব। পঞ্চানন ওরফে পাঁচু শুধু পেশাকে আঁকড়েই থাকেনি রেশমের থান বোনা খটখটি তাঁত ছেড়ে বালুচরি শাড়ির শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা অর্জন করেছে। জাতব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হলে ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণির মানুষ সাধারণত জমিতেই আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করে :

> গজানন তার বড় ছেলে, পঞ্চানন সব থেকে ছোট। মাঝখানে চার বিটি। বড় বিটির শ্বশুরঘর মেদিনীপুরের গড়বেতায়। মেজোটির বাঁকুড়ার ছাতনায়, সেজোটির সোনামুখী, ছোটটির বিষ্ণুপুরের মধ্যেই, কিষ্টগঞ্জে। সব মেয়েরেই বিয়ে হয়েছে বটে তাঁতি ঘরে। এদানি তো আবার ইদিক-উদিকও হচ্ছে। ঘরে-বরে বিটিকুলে মিলমিশ থাকে না। তাঁতির বিটি বামুনের সঙ্গ নেয়, আগুরির বিটি চলে যায় পোদের ঘরে। লোহার কাহারে ভোদাভেদ থাকে না। [...] কিন্তু জগতের সব মেয়েরেই বিয়ে হয়েছে জাতের ঘরে। দুই ছেলেরও। তবে গড়বেতায় আর ছাতনায় কুটুমবাড়িতে তাঁত নেই। জাত-ব্যবসা উঠে গিয়েছে অনেক কাল আগেই। জমিজিরেত চাষাবাস, তার সঙ্গে ছোটখাটো দোকানদারি। এক জামাইয়ের মনোহারি, আর এক জামাইয়ের মুদি দোকান। (৫৭৮)

টানা-পোড়েনের জগৎ এ সময়ের মতই কিন্তু পরম্পরা সূচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে অর্থনৈতিক বা ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ার ওপর লেখক প্রত্যক্ষভাবে ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা উৎপাদনের পদ্ধতি ও উপাদানের বর্ণনা দিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। অনেকটা সংবাদ জানানোর মতো। *গঙ্গা* উপন্যাসে ১৯৫৭-য় সমুদ্রযাত্রার যে প্রতীকী উত্তরণের কথা ছিল, *টানা-পোড়েনে* স্বপ্নের কথা যে বলা নেই তা নয়– 'যেন আকাশের নীচে স্বপ্নময় এক দূরান্তরে মিলিয়ে যাওয়া বালুচর। বালুচরী শাড়ীও এক স্বপ্ন, স্বপ্নে পাওয়া।' (৫৮২)

তাঁতশিল্পীদের প্রাত্যহিক জগৎ-জীবন, অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা, তাই সহজ-সাবলীল-প্রত্যক্ষভাবে, *টানা-পোড়েনে* চিত্রিত হয়েছে। পাঁচু কীত ও তার পরিবারের জীবনবৃত্তই ঘুরে ফিরে উপন্যাসে আবর্তিত হয়েছে। এখানকার জীবন-দেশ-কাল অনেক ক্ষেত্রেই অনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ। ফলে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত। সেই সংযুক্তির প্রধান সূত্র মূলত ঈশ্বরদাস। যে সূত্রে *টানা-পোড়েনের* অন্ত্যজ খেটে-খাওয়া মানুষগুলো তাদের যুগ যুগ ধরে লালিত পৈতৃক ঐতিহ্যের ভাঙনের সুর শুনতে পায়। একইভাবে তাদের স্বপ্নগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে।

লেখক তাঁতযন্ত্র ও তাঁত চালনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেন। যেমন, "খাচান দড়ি, জালিপাটা, ছুঁচ মৌরি, জেকার্ড মেশিনের সঙ্গে এই তিনে মিলে প্রথম বন্ধন বালুচরির।" (৫৮১)। লেখকের বর্ণনায় উঠে আসে ছোট ছোট মাকু, মীনা-রঙ-রেশম, গলানি-চালানি, পারডোবা, চরকা, লাটাই ফাঁদালি ইত্যাদির সূক্ষ্ম বর্ণনা। একটা অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সঙ্গে লেখক মিশিয়ে দিয়েছেন জীবনের শ্রম এবং অন্তহীন সংগ্রামকে। তাঁতি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। পাঁচুর সংসারে দারিদ্র্যের বর্ণনা যেমন পাওয়া যায়, তেমন জানা যায় তাঁতির ঘরে কেউ বসে খায় না। পরিবারের সকলে তাঁতের কাজে অংশ নেয়। এছাড়া ঘরের বউ মোতি বাজারে তসর লাড়ো বিক্রি করে সংসারে আয়ের পথ সুগম করে। এ কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, তাঁত ছেড়ে কেউ চাষের কাজে নেমেছে, কেউ দোকানপাট খুলেছে। সুতরাং দেশে বিদেশে বালুচরি শাড়ির যতই সুনাম ছড়াক তাতে তাঁতির কিছু লাভ হয় নি। দিনে দিনে তাঁতি শুধু মহাজনের শিকার হয়েছে।

তাঁতির ঘরে হিসেব করে সুতো আসে ঈশ্বরদাসবাবুর গদি থেকে। এক কেজি কাঁচামাল থেকে সাড়ে সাতশো গ্রাম পাকা মাল দিতে হয়। আড়াই শো গ্রাম ছাড়। কেন না, কাঁচামাল পাকা করতে কিছু সুতো ঝরে পড়ে। তাছাড়া তাঁতিকে বিশ্বাস করে না মহাজন। কারণ, 'তাঁতিকে বিশ্বাস কি? সুতো যদি ভাঙতি করে? [...] ভাঙতি করা তো চুরি না। অভাবের সংসার, রাত পোহাতে দেখা গেল মুখে দিতে কিছু নেই। হাঁড়ি চড়বে না। এদিকে ওদিকে ছুটকো ছাটকা মহাজনের অভাব নেই। তখন তাঁতির হাতে মুখের অন্ন একমাত্র ঈশ্বরদাসের ভাঁঙা মাল।' (৫৮৩)। দায়ে পড়ে বাজারদরে কিছু মাল বিক্রি করে তাঁতি দু-চারদিনের অন্নসংস্থান করে। কিন্তু ঈশ্বরদাস ব্যাপারিও তাঁতিদের নাড়ি নক্ষত্র চেনে। কাঁচামাল দেওয়ার সময়ই মজুরির হিসাব থেকে শাড়ি আর থান পিছু টাকা কেটে রাখা হয় তাঁতি কল্যাণ সংস্থার নামে। যদিও সেই টাকা তাঁতি কখনো চোখে দেখে না :

> জীবনে যত কেজি পাট লিয়া করেচ, তত দফায় পাঁচ টাকা জমা। ক্যানে? না খাতায়পত্তরে উ টাকা জমা পড়বেক তোমার তাঁতি কল্যাণ সংস্থায়। তোমার যখন অভাব হবে, ছাঁয়েদের মামাভাত খাওয়াবে, বিটাবিটির বিয়ার খরচা লাগবেক, তখন তাঁতি কল্যাণ সংস্থা তোমাকে উ

> টাকার থেকে সাহায্য দিয়া করবেক। [...] সাহায্য কোনও দিন পাও নাই? কী করে পাবেক? তোমার সুতার হিসাব যে সবসময়েই গোলমাল হয়ে যায়? কী করে? উ তুমি বুঝবে নাই। খাতাপত্তরের হিসাব লিখাগুলান বড় ঘুগি। উয়ারা আমনার আমনার মনে, ই ঘর উ ঘর করে বদল হয়ে যায়। তুমি ও সবের কী বুঝবেক হে? তুমি অদ্ধপুতা যাও, পারডোবে পা ডুবিয়ে পাষাণলড়িতে পা রেখে বস গা। (৬২৭)

এছাড়া সরকারি আনুকূল্যে ব্যবসায়ীর হাত ফেরতা হয়ে তাঁতির জন্য যে অর্থ সাহায্য আসে, তার অনেক টাকা মার যায়। বিস্তর টাকার সন্ধান তাই তাঁতির জানা নেই। দারিদ্র্য তাঁতির জীবনকে নিয়ত পীড়ন করে যায়– 'হাতে থাকে দনা, পেটে থাকে উপোস। আজ ভাতের পাতে কেড়ালির ডাল আর পস্তলাড়া আছে, তো কাল মৌলা না মুড়ি। তার চেয়েও অধিক কপাল পোড়া হলে দাঁত ছরকুটি। তখন পেট পেটাও, বিটা-বিটি পিটাও, বউ পেটাও।' (৫৮৫)। তাঁতিরা চোখের সামনে দেখে রেশম খাদি মণ্ডলের সঙ্গে জড়িত যারা তথাকথিত ভদ্রলোক তাদের গাড়ি-বাড়ির রমরমা অবস্থা। অথচ পরবর্তী দিনটির অন্ন-সংস্থানের নিশ্চয়তা নেই তাঁতির কাছে।

অভয় খানের নকশা, যা পাঁচুর মাথায় করে রাখার বস্তু। গুণী মানুষটির সেবায়, গা ধুইয়ে কাপড় পালটে দেয়ার রোজকার কর্তব্যে পাঁচুর এক অসামান্য মানবিক চারিত্রিক প্রকাশ দেখা যায়। গুরুর অনুমোদন না পাওয়া অবধি সার্থকতা নেই। সমরেশ বসুর যে শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাঁচুর শিল্পী হয়ে ওঠার বিবরণে রয়েছে– সে খুব নিপুণ কাজ। বাস্তব যে কী প্রক্রিয়ায় পরিশ্রুত হয়ে শিল্পের বাস্তবে পরিণতি পায়, এইখানে সে প্রক্রিয়াটি অনবদ্য হয়ে ফুটেছে। পাঁচু তার 'লস্‌কা' খানির নাম দিয়েছে 'বেদেনির পট'। গত শ্রাবণ মাসের ঝাঁপানের হুল্লোড়ে দেখেছিল বেদেনির সাপ খেলানো। সাপ নিয়ে রঙ-ঢঙের অনেক কেরামতির মধ্যে থেকে বেদেনির, 'যেন কালো রঙ করা পাকা রেশমের শরীরখানি ছেনি-বাটালি দিয়ে কেটে-কুঁদে গড়া।' (৫৮৯)। চিত্রকল্পটি পাঁচুর পরিকল্পনার অংশ হয়েছে। আর বাঁশি বাজানো সাপুড়ের চেহারা 'লালমাটি পোড়ানো চেহারাখানিও বেশ ছিল। বাঁশের লাঠির মতো পেটানো ছিপছিপে।' (৫৮৮)। পাঁচু নকশায় আনতে চায় মেয়েটির ছন্দোময় দেহখানি, তার রঙ-চঙের অনেক অবাস্তব ছাপ এ শিল্পীর ধ্যান থেকে আপনি ঝরে যায়। নকশার মাঝে থাকে বেদে-বেদেনি, তাদের ঘিরে থাকে কড়ি আটা কুন্‌কে ঝাঁপি। সাপের অনুষঙ্গেই এসে যায় চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি এবং নকশায় ফোটে পাল তোলা নৌকার সারি। নৌকা ঘিরে পদ্মফুল। পর্যায়ে পর্যায়ে দৃশ্যের বিস্তারে গিয়ে পাঁচু কাজে লাগায় মদনমোহন মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ থেকে পাওয়া 'হাঁটু মুড়ে বসা হাত জোড় করা নমস্কারের ভঙ্গিতে পূজারিণীর দল।' (৫৮৯)। সৃজন প্রক্রিয়ায় কী উপাদান যে কেমনভাবে কাজে আসে তা হয়ত শিল্পী মানুষটিও জানে না। ধ্যানের 'লক্‌সা' কাগজে একে সঙ্গে হিশেব করে কোথায় কোন

রং হবে তা ঠিক করা হয়। শাড়ির আঁচলটি বানিদারের মেহনতে হয়ে ওঠে রেখায়-রঙে ধ্যানে-কল্পনায় জমাট হয়ে যাওয়া একখানা 'লজর কাড়ানি পট।' (৫৮৯)। এ কাজের জ্বালা-পোড়া বাইরের মানুষ বোঝে না। আর এই শিল্পী মানুষটির আর এক জ্বালা-পোড়া– যোগেন বীটের বৌ, 'জাত পোদ্দারের হাতে গড়া সোনার পিতিমে' টুকির দুরন্ত প্রেম– তারও মর্ম বাইরের কেউ বোঝে না। যেন পাঁচুও স্পষ্ট বোঝে না কোথা থেকে কে তাকে চালায়। টুকির টান আর লক্সার টান যে কীভাবে পাঁচুর অস্তিত্বে জড়িয়ে যায়– সে এক বিস্ময় স্বয়ং পাঁচুর কাছে। টুকির আশ্লেষে এক মুক্তি, আর এক মুক্তি পিঁড়ির উপরে পাতা কাগজে ধ্যানের নক্শাটি রেখায় ফোটানোয়। বাউরিপাড়ায় সুবলির হাতের ভাজা ভাজা, মানে ঝাঁজালো চোলাই গলায় ঢালতে ঢালতে পাঁচু বড় তৃপ্তিতে বলেছিল, 'বুঁয়েচু গ সুবলি, লকসায় বাঁচি লক্সায় মরি।' (৬৩৩)

উপন্যাসের ঘটনাংশ এক অর্থে সামান্য, জটিলতাও নেই তেমন। এক বর্ষাঋতুর সময়সীমার মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ফলে খুব বিস্তারে গেলে কাহিনির বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল, তা হয়নি। কিন্তু সামান্য এই গল্প অংশটুকুর এই বৃত্তের মধ্যেই এক ধরনের প্রসার ও বেধ আছে। তাঁতশিল্পীদের প্রাত্যহিকতার বাইরে নিয়ে যায় যোগেন বীটের বউ টুকি ও পাঁচুর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কটি। যে টুকি এক সময় সকলের চোখে ছিল বন্ধ্যা, যাকে দর্শন করাও ছিল অশুভ :

> তবু মোতির মন করে, উয়ার মুখ না দেখা ভাল। উয়ার সোয়ামির মুখও না দেখা ভাল। অন্য সময়ে না হোক, সাতসকালে বটে। ঘর থেকে বের হয়ে ঘাট যাবার পথে দেখা হওয়া, সে বড় আখরপোতা বিষয়। উ দিনটি ভাল যাবে নাই। এ হল মনের কথা। (৬০১)

সেই টুকিই প্রমাণ করে দেয় তার মধ্যে কোনো অশুচিতা নেই। টুকির সঙ্গে পাঁচুর সম্পর্কের সূচনা ওস্তাদ অভয় খানের পাঁচুর নকশাকে অনুমোদন দেওয়ার পর। যোগেন বীট নকশাদার, পাঁচুর প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়েই একে অপরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক। যোগেন বীটের বউ টুকির সঙ্গে পাঁচুর অনৈতিক সম্পর্কটিকে উপন্যাসে প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে পাঁচুর পৌরুষত্বকে। যোগেন বীট সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ্যা, সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতাশূন্য। যেমন নেই শিল্প সৃষ্টির সক্ষমতা, যদিও ঈশ্বরদাসের সঙ্গে ব্যবসা করে অবস্থা অনেক ভাল। বিবাহিত জীবনে টুকির সন্তানহীন অন্তঃসার শূন্যতার মাঝে পাঁচুর ঔরসে সে প্রথম সন্তান ধারণ করতে সক্ষম হয়। যে সন্তানকে সে বাঁচাতে চায় একান্ত সতর্কতায়। এমনকি পাঁচুকেও কাছে আসতে দেয় না। ঈশ্বরদাস যেমন পাঁচুর শিল্পসামর্থ্যকে ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছেমতো, তেমনি বড়লোক যোগেন বীটের স্ত্রী টুকিও পাঁচুকে ব্যবহার করে তার নিজের ইচ্ছের খাতিরে। এত কালের প্রচারিত বন্ধ্যানারী

নকশাদারকে নয়, ব্যবহার করেছে নকশাদারের বুননের সামর্থ্যটুকুকে। পাঁচুর প্রতি টুকির আকর্ষণ-বিকর্ষণ শিল্পী ও শিল্পের নিয়তিকে চূড়ান্ত মাত্রায় প্রতিস্থাপিত করে। পাঁচুর নকশায় শিল্পও খানিকটা পরকীয়ার গর্ভে সৃষ্টির বীজ বোনার মতই, যা ঈশ্বরদাসের ব্যবসার জগতে বালুচরী আনার মতো। কিন্তু প্রমাণিত হয় পাঁচু সৃষ্টিক্ষম, বন্ধ্যা জমিতে ফসল ফলাতে পারে। শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা শরীরী মাত্রা পায়। পাঁচুর বউ মতি সবকিছু বুঝেও খুলে রাখে আশ্রয়ের বিস্তার। ঈশ্বরদাসের প্রত্যাখ্যানে ভেঙ্গে পড়া পাঁচুকে সে-ই কাছে টেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত মতিই উজ্জ্বল হয় অনুকম্পায়। পাঁচুর প্রতি তীব্র ভালবাসায়, পাঁচু-টুকির ঘটনা জেনেও রহস্যময়তায়, প্রেমে সে মহান হয়ে ওঠে।

ওস্তাদ অভয় খানের সাগরেদ পাঁচু কীতের একটি বালুচরী শাড়ির নকশা করা, অভয় খানের অনুমোদন ও ঈশ্বরদাসের নক্শা নেওয়ায় রাজি না হওয়া– এই পরিপূরক তিনটি বিষয় উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই ঘটনা পরম্পরার কেন্দ্রে রয়েছে পাঁচুর স্বপ্ন যা তাঁতি জীবনের ছোট জগতের সীমাটাকে আর দশটা খেটে খাওয়া মানুষের স্বপ্ন পূরণ তথা পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেশ-কালের গণ্ডীর বাইরে। নকশাটি অভয় খানের অনুমোদন পাওয়া মানে শিল্পের সার্থকতা। আর অপরদিকে ঈশ্বরদাসের অনুমোদন মানে ব্যবসায়ের সফলতা। পাঁচু প্রথমটিতে সফল হওয়ায় তার শিল্পীসত্তা জয়ী হয় কিন্তু ঈশ্বরদাসের ভাষ্যে, 'ওসব বালুচরী শাড়িটাড়ি আজকাল আর লোকে কিনতে চায় না। [...] পড়তায় আসে না, দাম বেশি। ছোট খাটো নকশা হলে আজকাল ম্যাকসির জন্য বোনা যায়। ও কাজটা তুমি বন্ধ করে দাও, আর দরকার নেই।' (৬৬১)

অভয় খানের শিল্প-প্রেরণা দেয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা শরীর কেড়ে নিয়েছে। অভয় খানের মৃত্যু যেন শিল্পেরই স্বাধীন মৃত্যু, যার সূচনা ঈশ্বরদাসের মতো মুনাফাসর্বস্ব ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে। এ ঘটনা কেবল পাঁচু কীতের জীবনের নয়, লেখক-শিল্পী সকলেরই কথা। বাজারে যার কদর নেই তেমন লেখা, আঁকা ছবি বা গান অচল। পাঁচুর এই ছোট গণ্ডীবদ্ধ জগতের তুলনায় ঈশ্বরদাসের জগৎ আপাত দৃষ্টিতে বড় ও বাণিজ্যিক মনে হলেও, কার্যত এই ব্যবসায়ীও বৃহদায়তন পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র পরিগণ্ডীরই অধিবাসী। বাস্তবতার বিচারে তার জগতের সীমার বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারে না। এই কেবল লাভ-ক্ষতির হিসাবে বিশ্বাসী মুনাফাভোগী ঈশ্বরদাসের কাছে শত অভাবের টানাপড়েনেও পাঁচু তার শিল্পীসত্তাকেই জয়ী করে তোলে। উপন্যাসে ঈশ্বরদাসের উপস্থিতি কম কিন্তু অমোঘ। শিল্পীকে বাজারের সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হয়। অভয় খান যেমন পাঁচুকে শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত করেন, তেমনি ব্যবসায়ের দিক থেকে অনিবার্য ভূমিকা ঈশ্বরদাসের। সে যখন বলে বাজারে বালুচরির কদর নেই, ও কাজটা পাঁচু বন্ধ করে দিক– তখন এই সঙ্কট শিল্পীর আঁতে ঘা দেয়। ঈশ্বরদাস শিল্প বোঝে না, বোঝে বাজার আর চাহিদা। তাই সে ছোটখাটো নকশার কথা বলে যা আজকাল ম্যাকসির জন্য বোনা যায়। শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ একটি

অবশ্যম্ভাবী ঘটনা হলেও তাঁতিদের ক্ষেত্রে তা হয়ে যায় শিল্প বনাম অন্ত্যজ মানুষের পেশার সঙ্কট।

উপন্যাসে তাঁতশিল্প মূল কেন্দ্র হলেও সঙ্গত সূত্র হিসেবে উঠে এসেছে বাকুরা জেলা-সংশ্লিষ্ট নানা লোকাচার। 'ঝাপান' এক বিশেষ লোক-উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র এই উৎসব প্রচলিত আছে। সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি এক অর্থে দেবী মনসার পূজা। (সৌমেন দাস ২০১৬ : ২০৭)। উপন্যাসে বাঁকুড়ার এই অঞ্চলেও দেখা যায় প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে ঝাঁপান উপলক্ষে মেলা বসে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসে দলে দলে নানা বৃত্তির পসরা নিয়ে। রাঢ় অঞ্চলের বেদে-বেদেনিরাও সাপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখায়, পয়সা উপার্জন করে। বস্তুত বাঁকুড়া জেলার লোকায়ত সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক উৎসব মনসা পরব ও ঝাঁপান। বিষহরি মনসা এখানকার শ্রেষ্ঠ লোকপ্রিয় দেবী। সর্পাঘাতে মৃত্যুজনিত ভীতি থেকে মুক্তির মানসেই এখানে মনসারবিষহরি পূজার ব্যাপকতা। টিলা ডুংরী খাল বিল, জলজঙ্গল পরিবৃত লালমাটিতে মৎস্যজীবী, শিকারজীবী মানুষের জল-জঙ্গলে বিচরণে সর্পাঘাতে মৃত্যু এবং এই অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের আকুতিতে রাঢ়ের মধ্যমণি বাঁকুড়াতে সর্পদেবী মনসা, বিষহরি, জগৎগৌরি, জাঙ্গুলীমাতার পূজা-আরাধনার ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। (শুভাশিষ দত্ত ২০০৮ : ৫৪৫)। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার প্রধান উৎসব, চলে সারা ভাদ্র মাস ধরে। মনসা পূজার পরদিন থাকে অরন্ধন 'পান্তাভাত'। এ দিন পান্তাভাত পেটে পড়লে নাকি সাপের বিষ মাথায় ওঠে না। এই দিন বিকেলে বসে ঝাঁপান মেলা অর্থাৎ সর্পক্রীড়া প্রদর্শন।

লক্ষণীয়, ঝাঁপান মনসা পূজারই অঙ্গ। ঝাঁপান-মেলার মূল আকর্ষণ সর্পক্রীড়া প্রদর্শন। এতে গুনিন-ওঝাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা চলে। গুনিনের দল সুসজ্জিত শকটে সাপের ঝাঁপি নিয়ে হাতে, গলায়, মাথায় জীবন্ত বিষধর সাপ ঝুলিয়ে সাপের খেলা দেখায়। বস্তুত মানুষে-মানুষে মিলনে, ভাবের আদান-প্রদানে, কেনা-বেচার আনন্দে ঝাঁপান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া শহরের রামপুর মনোহরতলা, দোলতলা, মানকানালী, কেঞ্জাকুড়া, লাউদা, ইন্দপুর, খাতড়া, ছাতনা, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়েব প্রভৃতি গ্রাম-শহরে মনসা পূজা-কেন্দ্রিক ঝাঁপান মেলা বসে। তবে ইদানীং ঝাঁপান মেলায় সাপ খেলা হারিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ঝাঁপানের সঙ। (মন্টু দাস ২০০২ : ৬৯,৭০)। উপন্যাসে তাদের প্রসঙ্গ এসেছে এই ঝাঁপান মেলায় পাঁচুর সাপ-খেলা দেখার সূত্রে :

> বেদেনী সাপুড়ে মাঝে মাঝে ডুগডুগি বাজাচ্ছিল। কিন্তু উয়ার বাঁশের বাঁশিখানি আর হাঁটু নাড়িয়ে নাড়িয়ে সাপ খেলানোও বড় মনোহর হয়েছিল। কেবল তো খরিশ না, যাকে বলে গোখরো। কালি খরিশ, দুধ খরিশ– এসব নিয়ে খেলা। সে আবার তার মাথার পাগড়িতে ছেড়ে দিয়েছিল একখানি লাউডগা, আর একটি বাতাসী। লাউডগাটা সিঁড়ির

> মতো কয়েকটা ধাপ তুলে দাঁড়িয়েছিল। লাল বিন্দু চোখের কোণ দুটি যেন নরুন দিয়ে টুকুস চেরা। সাপের অমন কাজল পরা চোখ দেখা যায় না। আর বাতাসীটা তার লম্বা সরু, রেশম বোনার ইস্পাতের মাকুর মতো রঙ শরীরটাকে যেন বর্শার মতো খোঁচা করে রেখেছিল। সময় বিশেষে উয়ারা নাকি উড়তে পারে, তাই নাম বাতাসী। মা মনসার ডাক শুনলে বাতাসের আগে ছোটে। বিষ নাকি জব্বর। (সমরেশ বসু ২০০৩ : ৫৮৮)

উপন্যাসে এদের কথাও আমরা পাই। যদিও এই আঞ্চলিক উপন্যাসে কথাকার বহু জনগোষ্ঠীর জীবনধারার পরিচয় সবিস্তারে উল্লেখ করলেও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনকথাই মূলত প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন– সেই উপজীব্য সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের জীবনাচার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনসংস্কৃতি, উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য, এমন কি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও বাদ দেননি। আসলে জনবিন্যাসের আদলেই জীবনবিন্যাসের প্রতিরূপ নির্মিত হয়েছে উপন্যাসে। তাই এখানেও আমরা দেখতে পাই তন্তুবায় সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য বৃত্তিজীবী মানুষের কথা এসেছে। ছোট বাউন ঠাকুর যেমন যজমানি আর যোগেন বীটের ঘরে 'নারাণ-পূজা' করে জীবিকা নির্বাহ করে, তেমনি ঠাকুরপাড়ার মেজ ভটচাজ 'হোমোপ্যাথ ওষুধ দিয়া করে'। ওস্তাদ অভয় খানের ছেলে অবিনাশ গঞ্জের বাজারে দোকানদারি করে বংশগত তাঁত শিল্পোৎপাদনের পেশা ছেড়ে দেয়। 'মাধবগঞ্জের বাজারে মাছ আনাজপাতি নিয়ে যারা বসে তারা অনেকেই হাড়ি বাউরি।' (৬০২)। কখনো কখনো এই এলাকার 'তাঁতীরা' মদনগোপালের মন্দির চত্বরেই 'তাশন' করে। 'মাটিয়ালিরা' মাটি কাটে, ভোরবেলায় জয়পুরের শালবনের ভেতর থেকে কুড়িয়ে ভেঙে নিয়ে আসে শালের শুকনো ঝাটি কাটি সরু ডালপাতা। গেরস্থদের জ্বালানি হিসেবে তারা বিক্রি করে। আবার দেখা যায় মাধবগঞ্জের বাজারে এই অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য আনাজপাতি ও মাছ বেচতে আসে। তাদের মধ্যে :

> কয়েকটি বাউরি হাড়ি বিটি বউ এর মধ্যেই পা ছড়িয়ে বসে গল্পগাছা করছে। উয়াদের মধ্যে একটি বুড়ী, মাটি চৌচির গালের ভাজে হাসছে, আর চুটি টানছে। বুঝ ক্যানে, উয়াদের মালপত্র যা বিকোতে এনেছিল সব বিকিয়ে গিয়েছে। গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাসি গল্প করা দেখলেই বোঝা যায়, বিক্কির বাটা ভালই হয়েছে। (৬০২)

লক্ষণীয় এই বাজারে 'তসর লাড়ো'র বেচাকেনা হয়। মোতি এই বাজারে 'তসর লাড়ো' বেচতে এসেছে। ব্যাপারীরা মাল পরখ করে তবে জিনিস কেনে। কেননা :

> অনেক সময় পোকাগুলো পচে যায়। টিপলেই ফেটে যায়, দুর্গন্ধ বেরোয়। সেটা হয়, অনেকদিন রেখে দিলে। মোতির মনে উ নিয়ে

> কোনো আন ভাবনা নেই। নিজের হাতে সে প্রতিটি লাড়ো দেখে এনেছে। তাঁতীর বিটি, তাঁতীর বউ, সে কি জানে নাই, বাউরি হাড়িরা প্রতিটি লাড়ো দেখে লিবে? উয়াদের মুখের খাবার জিভের স্বোয়াদের দ্রব্য। (৬০৩)

তাছাড়া বাজারে নারীরাই মাছ বিক্রি করে। উপন্যাসে মোতির মাছ ক্রয় প্রসঙ্গে কথাকার এই বাজারের বর্ণনা দিয়েছেন :

> বউ বিটিই বেশি, দু-একজন বুড়া মরদ। বড় মাছের দিকে মোতি তাকিয়ে দেখলো না। যাতে পোষাবে না, সেদিকে দেখেও লাভ নেই। দু জায়গায় ছোট ছোট পুঁটি আর ময়া মাছ রয়েছে। মৌরলারই নাম ময়া। দু-একজনের কাছে শামুক গুগলি আছে। উসব তাড়াতাড়ির সময় ভেঙে ছাড়ানো, তৈরি করা চলে না। পুঁটি ময়ারও দাম কম না। আট, লয় ত সাত টাকার কমে কথা নাই। ইদিক উদিক দেখতে দেখতেই, এক বুড়ীর কাছে কিছু ইজলি চোখে পড়লো। কুঁচো চিংড়ির স্বাদ আছে। তবে ইজলিগুলান বড় ছোট, তার মধ্যে বুড়ী আবার গুচ্ছের শ্যাওলা জড়িয়ে রেখেছে। চার টাকা কেজির ইজলি দরাদরি করে তিন টাকায় নামিয়ে, বারো আনা দিয়ে আড়াইশো কিনলো। (৬০৫)

এই প্রাত্যহিক ছোট জগৎ-জীবন ও তাকে ছাপিয়ে উঠারই অবয়ব ধরা দেয় *টানা-পোড়েন* উপন্যাসে। জগতটা যে বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে বাঁধা, এ আভাস নিশ্চিতভাবেই সমরেশ বসু দেন, কিন্তু সেটাকে উপন্যাসের বাঁধনে বড় করেন না। ছোট জগৎটার বাস্তব ও বাস্তব-অতিরিক্ত অস্তিত্ব কখনো প্রকৃতিবাদী, কখনো বাস্তববাদী, কখনো প্রতীকী চিত্রায়ণে *টানা-পোড়েন* হয়ে ওঠে একই সঙ্গে তাঁতিবিশ্বের ছবি, আবার মনুষ্যজীবনের রূপক। পাঁচু কীতের জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা কেবল পাঁচু কীতের থাকে না, হয়ে ওঠে নীতি-নৈতিকতার আধারে সকল মানুষের। ঈশ্বরদাসের প্রবল বাধা, শোষণ সত্ত্বেও পাঁচু কীতেরা বেঁচে থাকে, জীবন চলে– এই সত্য উচ্চারণ করে সমরেশ বসু এ সময়ের হতাশ-অবসাদগ্রস্ত অস্তিত্বে নতুন উজ্জীবন আনতে চান। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৯ পর্বের অসহায়তা, অন্ধকার এভাবেই কাটে। ঈশ্বরদাসের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও সে সিদ্ধান্ত নেয়, 'হঁ আমি থামতে লারবক, থামতে লারবক ছোট বউ (মতি)। থমবুনা করবক। খটখটি তাঁত চালাবক, কিন্তু হঁ, ই লসকার শাড়ি আমি বুনা করবক।' (৬৬২)। কারণ অভয় খান বলেছিল, 'হঁ বড় সোন্দর এঁকেচু র‍্যা পাঁচু, বড় সোন্দর লসকা হঁইছে।' (৬৬২)। 'সোন্দর' শব্দটির গুণেই পাঁচু হারিয়ে দেয় ঈশ্বরদাসকে। আর তাদের বংশগত বৃত্তির প্রতি ভালবাসার অসাধারণ সাক্ষ্য বহন করে চলে। তাই ঈশ্বরদাসের কথায় ভেঙে পড়তে পড়তেও পাঁচু উঠে দাঁড়ায়। ভাবে, জীবন

কখনো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে না। ‘চল হে লসকাদার চলতে হবেক। জীবন বুনা হঁইচে, টানা ভরনায় বুনা হঁইচে। জীবন বুনে চল্ রই হে, জীবন বুনে চল্ রই।’(৬৬২) পঞ্চানন কীত এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, যার স্বপ্ন বা ইউটোপিয়া পাঁচু কীতের অস্তিত্বকে ধরে রাখে। ১৯৫৭-এর সমুদ্রে যাওয়া পরবর্তী সময়ে ভাঙনে থাকে না, একইভাবে পাঁচুর বালুচরি শাড়ির স্বপ্ন ভেঙে যায় ঈশ্বরদাসের কথায়– ‘ওই নতুন যে নকশীটা করছে। ওটা আর কোরনা। [...] ওসব বালুচরী শাড়িটাড়ি আজকাল আর লোকে কিনতে চায়না।’ (৬৬১)। এই স্বপ্নভঙ্গ এক অর্থে শিল্পেরই ভেঙ্গে পড়া। শিল্পীগুরু তাকে ছাড়পত্র দিলেও, ঈশ্বরদাসের কথায় পাঁচু ভেঙ্গে পড়লেও তার স্বপ্নকে ভাঙ্গতে দেয় না। তাকে ‘লকসার শাড়ী’ বালুচরী বুনতেই হবে। ‘জীবন বুনে চলারই হে, জীবন বুনে চলারই’ (৬৬২)– প্রায় মন্ত্রের মতো উপন্যাসে শেষ ছত্র বাজতে থাকে যেন পাঁচুর সঙ্গে পাঠকেরও হৃদয়ে। বালুচরী শাড়ি বোনার স্বপ্নই উপন্যাসের মূল বিষয়, যা অন্ত্যজ মানুষগুলোর স্বপ্নের ভিত্তি স্পষ্ট করে।

সহায়কপঞ্জি

অর্জুন ডাঙলে (২০১১), ‘দলিত সাহিত্য : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’, *দলিত*, (সংকলন ও সম্পাদনা : দেবেশ রায়), তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

কঙ্কর সিংহ (২০১০), *আমি শূদ্র আমি মন্ত্রহীন*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৯৭৩), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ২য় ভাগ*, ২য় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

মণ্টুদাস (২০০২), “লোক উৎসব মেলা- ‘বাঁকুড়া’”, *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ*, (সম্পাদক : মালিনী ভট্টাচার্য ও অন্যান্য), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪১৮ বঙ্গাব্দ), *মনুসংহিতা*, (সম্পাদনা ও অনুবাদ : মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), দ্বিতীয় প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), *রবীন্দ্র রচনাবলী* (বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শুভাশিস দত্ত (২০০০), ‘সমরেশ বসুর গঙ্গাঃ পুনর্বীক্ষণ ও আঞ্চলিকতার পুনর্বিবেচনা’, *সমরেশ বসু: মানুষের কথাকার*, (সম্পাদক : স্বপন দাসাধিকারী), *এবং জলার্ক*, সমরেশ বসু সংখ্যা ১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

স্বপন দাসাধিকারী (২০০০), ‘সমরেশ বসু : জীবনপঞ্জী’ , *এবং জলার্ক*, (সম্পাদনা : স্বপন দাসাধিকারী), সমরেশ বসু সংখ্যা, কলকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী (২০১৩), *সমরেশ বসু : আমাদের বাস্তব*, একুশ শতক, কলকাতা।

সমরেশ বসু (২০০৩), *সমরেশ বসু রচনাবলী ৮*, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সৌমেন দাস (২০১৬), ‘ঝাপান’, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, (সম্পাদনা : বরুণকুমার চক্রবর্তী ও অন্যান্য), তৃতীয় সংস্করণ, দে বুক স্টোর, কলকাতা।

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Edited by Colin Mcintosh, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Fourth Edition, Cambridge, 2013.

An open class system, Category: Sociological terminology, *Wikipedia*, the free encyclopedia, Accesed on 2/11/16.

[Abstract : *Tanaporen* (1980) is the novel of the third stage of Samaresh Bose's fictional literature. It is the struggle of keeping the profession of the weaver's community on-going/stable. The novel does not deal with a large number of characters, rather it pictures the inner and outer analysis of a single man representing the weaving community as a whole. It expresses the poverty, exploitation & politics oriented weaving industry through the dreams & despairs of Pachu kitt. *Tanaporen* has been evaluated on the light of the industry, profession & continuous friction in the mirror of the subaltern people.]